ধারাবাহিক রচনা

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর স্মৃতিচারণ

কণা বন্দ্যোপাধ্যায়

জানুয়ারি ২৬। দুপুরের দিকে সারগাছি পৌঁছে সামান্য অপেক্ষা করার পরই পূজনীয় মহারাজের দর্শন পাওয়া গেল। শুনলাম একটু আগেই তিনি আমাদের খোঁজ করছিলেন। হলঘরে গিয়ে বসার পর মহারাজের নির্দেশমতো 'সৎপ্রসঙ্গ' থেকে 'আত্মসমর্পণ' অধ্যায়টি পড়া হল। একজন ভক্ত ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন—''মা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো।/ আমি কেন অন্ধ মাগো দেখি শুধুই কালো।''

এরপর আলোচনা শুরু করলেন পূজনীয় মহারাজ : ''আজকের পঠিত বিষয়টা সাধনার শেষ পর্ব। এমন একটা সময় আসে যখন মহামায়া সব ভার নিজে নেন। মা-ই সব করে দিচ্ছেন—সাধনার মাধ্যমে এই অবস্থা লাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কী আত্মসমর্পণ, কী শরণাগতি! তিনি মাকে নিজের সব ভার দিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন, 'মা আমি কিচ্ছু জানি না, বুঝি না, তুই কেমন আমায় বুঝিয়ে দে, জানিয়ে দে। আমি যে ছেলে! ছেলের মা চাই না?'

''গীতা, উপনিষদের সার কথা সব ঠাকুরের মুখ দিয়ে বেরোত। তাই ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে তাঁর কাছে আসত তাঁর কথা শোনার জন্য।

''প্রয়োজন ষোলো আনা আত্মসমর্পণ। পাঁচসিকে পাঁচআনা শরণাগতি—আর কিছু নয়। এই আমিটাকে মারতে হবে। নাহলে তিনি আসবেন কী করে? তাঁর আসার পথ যে 'আমি' বন্ধ করে রেখেছে! যত আত্মসমর্পণ করবে, তত তুমি তাঁর হয়ে যাবে। এটা কম কথা নয়। আমরা যে রাতদিন 'আমি'র পূজা করছি, ওটাকে শেষ করতেই হবে। তুমি তাঁর হয়ে যাও। গানে শুনলে তো, তিনি আমাদের দিব্য চক্ষু দেননি, যখন সেটা দেন, তখন আসে শিশুর মতো পূর্ণ নির্ভরতা। মা ছাড়া আর কিছু জানি না।

''ঠাকুরের জীবনের বড় কথা আত্মসমর্পণ। তাই মা তাঁর সব ভার নিয়েছিলেন—হাত ধরে নিয়ে চলেছিলেন সর্বদা।

''সব জিনিসে একটা ভাব আরোপ করতে হয়। তারপর আসে সিদ্ধি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে শ্রীভগবান বললেন, 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ।' দক্ষিণেশ্বরে সাধনার সময় ঠাকুর বালকভাব আরোপ করেছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর সমস্ত সাধনা সংঘটিত হয়েছিল। আমলকী গাছের তলায় কাপড় পইতে ফেলে ঠাকুরের অদ্ভুত সাধনা। এ কী সাধনা! এমনটা কোথাও শুনেছ? মাকে ডাকতে গেলে কাপড়, পইতে ফেলতে হবে কেন? ভাগ্নে

হৃদয় অবাক হয়ে যান। ইট ছুঁড়ে চেষ্টা করেন মামাকে ভয় দেখাতে। তন্ময় ঠাকুর কিছুতেই বিচলিত হন না। এটি তিনি কেন করতেন? একটি সুন্দর ভাব রয়েছে এতে। ক্রোধ, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি অষ্টপাশে জীব বদ্ধ। এই পাশ খুলে গেলেই জীব হয় শিব। তাই ঠাকুরের এই অদ্ভুত সাধনা।

''এই বন্ধন আমাদের কাটাতেই হবে। নাহলে ভগবান লাভ হবে না। পাশ—bondage, সমস্ত উপাধি ফেলে দিতে হবে। 'আমি'-টা ভগবান লাভের পথে প্রধান অন্তরায়। এটা থাকলে তাঁকে পাবার কোনও আশা নেই। তাই ঠাকুর এটা ত্যাগ করলেন। অষ্টপাশ মুক্ত হয়ে তিনি মাকে ডাকতেন। বালকেরা তো এই অষ্টপাশ হতে মুক্ত। তাই নিজেতে এই ভাব আরোপ করলেন ঠাকুর। বালকের সরলতা, পবিত্রতা, নির্ভরতা নিয়ে তিনি মাকে ডাকতেন। এই ভাব নিয়েই তাঁর দীর্ঘ সাধনা। মাকে চাই-ই চাই। অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হলেন বালকভাবে, আর তখন মাকে পেলেন।

''ভগবান লাভ করলে সাধকের জীবনে পিশাচ, উন্মাদ, জড় ও বালক—এই চারটি ভাব আসে। বামাখ্যাপাকে সকলে উন্মাদ ভাবত। ঠাকুরকে সকলে বলত পাগলা বামুন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অদ্ভুত সাধনার সময় বেলতলা বা পঞ্চবটীর দিকে কেউ যেত না। ঠাকুরের সাধনার কালে এক অদ্ভুত পাগল দক্ষিণেশ্বরে এসেছিল—জ্ঞানোন্মাদ ওই পাগলের পিছনে ঠাকুর হৃদয়কে পাঠিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ওই জ্ঞানোন্মাদ হৃদয়কে বলেছিলেন, 'যখন এই ডোবার জল আর ওই গঙ্গার জল এক বলে বোধ হবে তখন জানবি হয়েছে।' কী অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!

''বালকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঠাকুরের কী হল? মা তাঁর সব ভার নিলেন। প্রথমে তাঁর হাত ধরতে হয়, তবে তো তিনি এসে তোমার হাত ধরবেন।

''আমরা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে এগোতে ভুলে গেছি। ঠাকুরের দৃষ্টান্ত—বেড়ালছানা আর বাঁদরছানা—প্রথমে বাঁদরছানার মতো মাকে আঁকড়ে ধরতে হবে, তবে তো মা তোমাকে বেড়ালছানার মতো করে ধরে নেবেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে—তবে তো মা তোমাকে ধরে থাকবেন। বাবার হাতটা তোমায় প্রথমে ধরতে হবে, পরে নিশ্চয় বাবাই তোমার হাত শক্ত করে ধরবেন। ভগবান নিজে এসে ভক্তের ভার নেন। মা এসে নিজে ঠাকুরের হাত সর্বক্ষণ ধরেছিলেন। একেবারে তাঁরই যন্ত্রস্বরূপ হতে হবে। টান চাই, সাধন চাই।

''সাধনের সঙ্গে চাই তাঁর কৃপা। শুধু পুরুষকার দ্বারা মানুষ তাঁকে পায় না। তবে উদ্যোগ তো চাই-ই চাই। শেষের কথা শরণাগতি। একেবারে ডক্টরেট কি হওয়া যায়? সাধন বিনা কিছুই হয় না।

''আমাদের সব টানটা, সব মনটাই যে সংসারের দিকে! এটি আসে সংস্কার থেকে—অভ্যাস দ্বারা যে এই সংস্কার গড়ে তুলেছি! 'অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিত'—এটি অর্জুনের প্রাণের কথা। 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'—এর থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রথমে চাই পুরুষকার, কৃপা পরে আসবেই। অভ্যাস চাই-ই চাই। শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়'—এটা তো মনে রাখতে হবে! আমরা একটা সংস্কারকেই আঁকড়ে ধরেছি। সংস্কার কাটানো অসম্ভব মনে হলেও সংস্কার তো কাটাতেই হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস চাই—নিরন্তর অভ্যাস চাই। অভ্যাস দ্বারাই শুভ সংস্কার গড়ে ওঠে।

''ঠাকুর একটা গান গাইতেন—'আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।/ আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী।' এই বিশ্বাসটা চাই। মা আসবেনই। শরণাগতি শেষের কথা। এটা এলেই আসে শান্তি, শান্তি,—অনাবিল সুখ। পথের অন্তরায় অশুভ সংস্কার। অভ্যাস দ্বারা তাকে দূর

সারগাছি আশ্রম : পুরাতন সাধুনিবাস (বর্তমানে অফিস)
সৌজন্য : সারগাছি আশ্রম

করতে হবে। তাই চাই অভ্যাস। তাঁকে সব ভার দাও, তাহলেই হবে। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।'

''এমন ছেলে আছে, সারাক্ষণই খেলনা নিয়ে মেতে থাকে—এটাই ৯৫ শতাংশ। আবার কেউ কেউ খেলনাও চায়, আর মাকেও চায়—এটা হল ৩ শতাংশ, আর যারা শুধু মাকেই চায়—তারা মোটে ২ শতাংশ। আসল কথা হল সব ভার তাঁকে দিতে হবে। গীতায় এত কথা বলার পর অর্জুনকে শ্রীভগবান বললেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—শরণাগত হও—আমি সব ভার নেব। এটা ভগবানের কর্তব্য। আবার ভক্তকেও তার duty স্মরণ করাচ্ছেন।

''আমরা তাঁকে ভার দিতে ভুলে যাই। তিনি আমাদের সবচেয়ে কাছের জন, আর আমরা তাঁকে ভুলে থাকি—এটাই জীবনের মস্ত এক tragedy।

''সংসারে চলবে হুঁশিয়ার হয়ে। অধিকারী হতে হবে। এগোতে হবে। আমরা যে এগোতেই চাই না। ধর্মজগতে কেবল নোঙ্গর ফেলে দাঁড় টেনে চলেছি। আসক্তি-নোঙ্গরে যে সব আটকে রাখছে! এই নোঙ্গরটি তো তুলতেই হবে। সব ভার তাঁকে দিতে পারলে আমি হালকা হব। ক্রাইস্ট বলেছেন, 'Come unto me, those who are heavily laden.' আমরা তো তাঁকে ভারটি দিতেই পারি!

''তোমরা বিশ্বাসী, নাহলে এসেছ কেন? সব মেনে নিতে হয়। যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি। মীরা বলেছেন, 'প্রীত করনা চাহি।' আমাদের যে সেটারই অভাব। সংসারে কী প্রীতিরই না আদান-প্রদান! পশুটা পর্যন্ত সেই প্রীতি আস্বাদ করে গোলাম হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা ভগবানকে একটু প্রীতির সঙ্গে ডাকতে পারব না? ঠাকুর যেমন বলতেন, খোলমাখানো জাব—গরু আর মুখই তোলে না। যে দিয়েছে আর যে খাচ্ছে—দুজনেই আনন্দে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে।

''মনটি ভগবানে রেখে সব কাজ করতে হয়। মনই শত্রু আবার মনই বন্ধু। মনটি তৈরি করতে হয়। শুদ্ধমনে যে তাঁর প্রকাশ! মন শুদ্ধ হলে ভেতরের আলো ফুটে বেরোবে। সাধন-ভজন, জপ-তপের মধ্য দিয়ে যেন কালিমাখা bulb পরিষ্কার হয়ে গিয়ে ভেতরের আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সাধন চাই।

''জীবনের উদ্দেশ্য একটা নির্দিষ্ট হওয়া চাই। তোমাকে চাই। তুমি তো ভেতরেই রয়েছ—আর আমি শুধু বোকার মতো কেবল বাইরে ঘুরে মরছি। তাঁকে জানলে যে সব জানা হয়ে যায়! তিনি আমাদের সবচেয়ে নিকটে—একেবারে বুকের ভেতর রয়েছেন—আমরা কেন বুঝি না!

''সংসারের কর্তব্য করতে হবে—তবে নিজেকে বদ্ধ করে নয়। সব তুমি, সব তোমার, তুমিময়। এই হল বিদ্যার সংসার। অবিদ্যার সংসারে কেবল আমি। মন যত শুদ্ধ হয়, আত্মসমর্পণ আপনিই আসে। তাঁকে নিয়ে সংসার করো। রামপ্রসাদ

বললেন, 'আমি কালীর বেটা।' কী ভয়? কোনও ভয় নেই।"

২৭ জানুয়ারি যথারীতি বিকেলের দিকে সারগাছি আশ্রমে পূজ্যপাদ মহারাজের কাছে পৌঁছলাম। তাঁর নির্দেশমতো 'সৎপ্রসঙ্গ' থেকে 'ডুব্ ডুব্ ডুব্' অধ্যায়টি পড়া হল। পাঠান্তে মহারাজ এই প্রসঙ্গেই আলোচনা শুরু করলেন।

''সংসারের পথ দীর্ঘ। 'গর্ভবাসে মহদ্দুখং ত্রাহি মাং মধুসূদন'—মনের এই অবস্থা না এলে আমরা অন্তর্মুখ হই না। সংসার আমাকে টেনে রেখেছে। এই টানটিই আসক্তি। এই নিয়ে সাধন করি বলেই কিছু হয় না। ঠাকুর বলেছেন, মুলো-শশা খেলে তারই ঢেঁকুর ওঠে। রাতদিন সংসারচিন্তাই করি, তাই তাঁর নাম স্মরণকালেও তা-ই হয়। এই বাধাই আমাদের তাঁর নামসমুদ্রে ডুবতে দেয় না। ডুবেছি একধারে—জমি, জরু, টাকা। এই চিন্তাতেই মন। বঙ্কিমকে তাই ঠাকুরের উপদেশ—ডুবতে হবে ভেতরে। নোঙর ফেলে দাঁড় টানলে কি নৌকা এগোয়? আসক্তি-নোঙরের জন্যই তো মন আমাদের এগোচ্ছে না। ডুবতে হবেই, না ডুবলে কি কিছু হয়? রামপ্রসাদ তো তোমাদেরই মতো সংসারী ছিলেন। দারিদ্র্য, শোক, সবকিছুই তো তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। ভক্ত হলে মা তাকে আরও যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করে নেন। রামপ্রসাদ কিছুতেই হাল ছাড়েননি, বলেছেন,

'ভূতলে আনিয়ে মাগো,
করলি আমায় লোহা পেটা।
তবু মা বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা।'

এ কি সোজা কথা নাকি! মাকে যেন তিনি challenge করছেন। এই যে লোহাপেটা, সে তো আমাদের বিষয়ের নেশা কাটাবার জন্যে। সংসার একটা নেশা, সত্যিই নেশা। যদুর মা ঠাকুরকে বললেন, 'আমার ছেলে সবসময়েই অন্যমনস্ক, তরকারিতে নুন দেওয়া না হলেও বুঝতে পারে না।' ঠাকুর বললেন, 'ওগো, এ তার বিষয়ের নেশা।' দেখেছ, কী নেশা! আবার দেখো, ভগবৎ-নেশাও আছে। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক সাধন করতেন কারণ নিয়ে। লোকে তাঁকে মাতাল বলত। রামপ্রসাদ বললেন,

'সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী বলে।
আমায় মনমাতালে মাতাল করে
মদমাতালে মাতাল বলে॥'

''এখানে মনমাতালে মাতাল হওয়া। ঠাকুরের মাতৃদর্শনে আনন্দের নেশা। শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, 'হ্যাঁগা, আমি এমন টলছি কেন? আমি কি মাতাল হয়েছি?' মা বললেন, 'তা কেন? তুমি যে মা কালীর ভাবামৃত পান করেছ।'

''কোটি জন্মের সংস্কারের নেশা আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অর্জুন নিরুপায় হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন—'অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিত'—প্রকৃতির নিগ্রহে চলেছি—কী করব বলে দাও। এ-অবস্থায় তোমায় লাভ করা অসম্ভব। সত্যিই অসম্ভব। স্বাধীনতা কোথায়? তাই তো শ্রীভগবান বললেন, 'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ'—ইন্দ্রিয়গণকে যারা ভগবৎকৃপায় শাসন করতে পারে তারাই সাধু। 'We have come to rule, but we are being ruled.' ইচ্ছাশক্তিকে develop করা, self control করা—যা আমরা গুরুগৃহে শিখতাম, তা-ই হল আসল শিক্ষা। কিন্তু তা কি আমরা পারছি? তাই তো শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ 'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ।'

''কাম, ক্রোধ, লোভ নরকের দরজা—আমরা কেবল এরই পিছনে ছুটছি। তাই অবতারপুরুষরা সাবধান করছেন—ওদিকে যাবে না। চিল একটা মাছ মুখে নিয়ে উড়ছে—শত শত কাক তার পিছনে ঘুরছে। বিরক্ত হয়ে শেষে চিল মাছটা মুখ থেকে

ফেলে দিল, তখন শান্তি। কিন্তু আমরা যে ক্রমাগত আরও মাছ সংগ্রহ করেই চলেছি—motto করেছি—'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ'—টাকা না থাকে তো 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

''সত্যকে ধর্মকে যে জীবনে গ্রহণ করেছে, তারই আসল সাধনা। ঠাকুরের বাবার কী সাত্ত্বিক জীবন! অসত্য এল পরীক্ষা করতে, সত্যকে তিনি আঁকড়ে ধরে রইলেন। সর্বহারা হলেন, কিন্তু রঘুবীরকে বুকে ধরে পথে এসে দাঁড়ালেন—কোনও দুঃখ নেই, আক্ষেপ নেই। তাঁর মনের জোর কত! প্রথমে একটু ভাবনা হল, রঘুবীরকে কোথায় রাখবেন—রঘুবীর তাঁর কোনও ভাবনা রাখলেন না। এসব পরীক্ষা সবারই আসে। শান্তি পেতে গেলে তাই ডুব দিতে হবে। খুঁজতে হবে ভেতরে।

পূজনীয় স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

''সাধুসঙ্গে বিষয়ের নেশা কাটে, বিবেক জেগে ওঠে। তখন মনে হয়—তাইতো, সারাদিন কী করছি? ঠাকুর 'ঘড়ি মেলানোর' কথা বলতেন। সাধুসঙ্গে মন regulated হয়, বিবেক আসে। সত্য-মিথ্যা, সার-অসার, নিত্য-অনিত্য বিচারবোধ জাগ্রত হয়। রামপ্রসাদ বলেছেন, 'ডুব দে রে মন কালী বলে।' আবার বলছেন, কাম ক্রোধ ইত্যাদি হাঙ্গরের হাত থেকে যদি রক্ষা পেতে চাও তো—'বিবেক হলদি গায়ে মেখে নাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।' যত ডুববে ততই আনন্দ।

''কথামৃতের সার কথা হল—১। ডুব দে, ২। এগিয়ে পড়, ৩। ঝাঁপ দে। কিন্তু যতই আঘাত পাই না কেন, আমরা কি ঝাঁপ দিই? ফিরতে কিন্তু একদিন হবেই। তাই দরকার সাধুসঙ্গ, সাধন, ভজন।

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥'

ভগবান ভক্তের কাছে প্রীতিপূর্বক ভজন চাইছেন। মীরাও বলেছেন, 'প্রেম লগানা চাহিরে মনোয়া প্রীত করনা চাহি।' প্রীতিপূর্বক ভজন কি আমরা করি? প্রীতি পরম সাধন—এটা কি আমরা ভাবি? আমাদের যে সব টেনে রেখেছে জমি, জরু, টাকা। সংসাররূপ কাঁঠালের কোটি জন্মের আসক্তিরূপ আঠা যে লেগে আছে, বিবেক-তেল কি সহজে লাগে? সে-অনুরাগ কোথায়? কাজেই ওই প্রীতি আসা কি সোজা, সহজ ব্যাপার? এর জন্য তৈরি হতে হবে। ঠাকুরের ছবি বসিয়ে শুধু দাও আর দাও। বিদুরানির কি প্রীতি! তাই তাঁর হাতের দেওয়া প্রীতিমাখানো কলার ছিবড়েটুকুও শ্রীভগবান পরম আদরে গ্রহণ করেন। পত্রং পুষ্পং—যা খুশি হোক না কেন—যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি—তা তিনি পরম আদরে গ্রহণ করেন। ওটা যে প্রেমপ্রীতি-মাখানো—ওটাই তো আসল।

''ডুব দেওয়া শেষের ব্যাপার। 'যঁহা রাম তঁহা নেহি কাম।' মনের সবটুকু যখন তাঁকে দিতে পারবে, তখন অন্য চিন্তা তো আসবেই না। তার আগে চাই বিচার। ভগবানকে জীবনের সার করতে হবে। 'প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিকে সঙ্গে লবি।' দেখো, রামপ্রসাদ তো গৃহী কিন্তু কী বলছেন তিনি—কালীকল্পতরুমূলে নিবৃত্তির সঙ্গে ভ্রমণ—আবার বিবেকটাও সঙ্গে চাই। এই হল আসল পথ। তাছাড়া উপায় নেই। তাহলে কী করতে হবে? ভজন।

বাসনা-কামনাভরা সংসারের অবস্থা তো দেখছ—ঠিক ওই চিলটার মতো। নেপালের মহারানি অত ধনী, কিন্তু অশান্তিতে জ্বলে যাচ্ছে। শান্তি কোথায়? ঠিক রাস্তাটা জেনে নিয়ে চলতে শুরু করো।

''ঠাকুরের হাতে তৈরি আদর্শ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, আবার আদর্শ গৃহী নাগ মহাশয়। নাগ মহাশয় মঠে এসেছেন। স্বামীজী তখন ব্রহ্মচারীদের বেদ পড়াচ্ছিলেন। নাগ মহাশয়কে আসতে দেখে ছেলেদের বললেন, 'ওরে, আজ ঠাকুরের এক মহাভক্ত এসেছেন, আজ পাঠ বন্ধ থাক।' উভয়ে উভয়কে দেখে আনন্দে আত্মহারা। আদর্শ সন্ন্যাসী তখন আদর্শ গৃহীকে প্রশ্ন করছেন, 'এত যে সব করলুম এ কি আমার খেয়াল?' দেখো আদর্শ সন্ন্যাসীর মনে সংশয় এসেছে। অবশ্য স্বামীজী সবই জানেন, তবু নাগ মহাশয়ের মান বাড়াবার জন্যই এ-প্রশ্ন। নাগ মহাশয় বলছেন, 'আপনার খেয়াল কোথায়? সবই তো ঠাকুর করাচ্ছেন। আপনার তো কত খেয়ালই হয়েছিল। আপনার নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকার খেয়াল কি মিটেছিল?'' কী অপূর্ব ভাব! ঠাকুরের ভাবে ভরপুর ছিলেন বলেই না স্বামীজী বলতে পেরেছিলেন—'শরীরটে থু থু করে ত্যাগ করব।' এই হল আসল ব্যাপার—ভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া। কিন্তু সাধুসঙ্গ ও বিবেকের প্রভাবে সাময়িক হুঁশ হলেও আমরা আবার ঝিমিয়ে পড়ছি। আকাঙ্ক্ষার আর নিবৃত্তি নেই। তাই পথ হল—ভেতরে, ভেতরে, ভেতরে।

''ঠাকুরের কাছে অধিকাংশই তো যেতেন গৃহী। ঠাকুর তাঁদের সংসারে থেকেই সাধনের শিক্ষা দিতেন। তাঁর কাছে কেবল দাও আর দাও। তুমি তাঁকে কী দিলে? তাঁকে দিতে হবে প্রেমপ্রীতি।

''শিক্ষা জিনিসটা আসলে কী? বীজ পুঁতলে, খুরপি দিয়ে খুঁড়ে জমি তৈরি করলে, সার দিলে, জল দিলে, গাছ তো আপনিই হবে। ইচ্ছা থাকলে সব সম্ভব হয়। একটা মেয়ে অনেক অসুবিধার মধ্যেও পড়াশোনা করে ডক্টরেট পেল। তাকে কৌশলটা জিজ্ঞেস করলুম। সে বলল, 'মহারাজ, ইচ্ছা থাকলে সব হয়।' ইচ্ছা—এইটিই হল আসল শিক্ষা—শরীর, মন, বুদ্ধির উৎকর্ষ। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণে আমরা কেবলই ভোগবাদের দিকে ছুটে চলেছি। আমাদের শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য তো আত্মার বিকাশ। Man cannot live by bread alone এইটা মনে রাখতে হবে। ভেতরে যেতে হবে। ডুবতে না পারলে তো রত্ন পাওয়া যায় না।''

হলঘরে কথাবার্তার পর, সন্ধ্যাবেলায় পূজনীয় মহারাজ তাঁর ঘরে আমাদের ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি প্রচুর ফল ইত্যাদি রাখা রয়েছে আমাদের জন্য। প্রণাম করে বললাম, ''মহারাজ, শুধু ফলমিষ্টি দিলেই হবে না, খুব আশীর্বাদ করুন। মাঝে মাঝে যে একটু একটু ভয় করে!'' প্রশান্ত মুখে অভয় দিয়ে বললেন, ''কী ভয়? তাঁকে খুব আঁকড়ে ধরে থাকো। একটাই তো জীবন, আর তো আসতে হবে না। তিনি নেবেন বই কী, নিশ্চয়ই নেবেন। ওই যে বললাম, মনে আছে তো? একেবারে শিশুর মতো হয়ে যাও। সমস্ত উপাধি ফেলে দিয়ে একেবারে শিশুর মতো হয়ে তাঁর কাছে যাবে। খুব ডাকবে তাঁকে। কোনও ভয় নেই।''

পূজ্যপাদ মহারাজের নির্দেশ ও অভয়বাণী আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিল। তাঁকে ভক্তিনম্র প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। আনন্দে অন্তর ভরপুর। তবু কেবলই মনে হচ্ছে, আর মোটে একটি দিন সারগাছিতে মহারাজের অবস্থিতি। ভাবি, ''যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন।'' *(ক্রমশ)*